

# বই পড়া

## প্রথম চৌধুরী

[লেখক-পরিচিতি : প্রথম চৌধুরী ৭ই আগস্ট ১৮৬৮ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলায় হরিপুর গ্রামে। তাঁর শিক্ষাজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে তিনি কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বস্তুত তাঁরই নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যধারা সূচিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, প্রবন্ধ সংগ্রহ, নীললোহিত, সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ ইত্যাদি। প্রথম চৌধুরী ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে কলকাতায় পরলোকগমন করেন।]

বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে। প্রথমত সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই। দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে সুন্দর জীবনধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা, মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহ। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে কেননা আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি এবং যিনিই যাই বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজারদর নেই। এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উলটো বুঝে প্রতি জনেই হতে চায় বড়োমানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের উপরেই পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। যারা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তারা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন; কেননা তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটাই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভাণ্ডার যে ধনের ভাণ্ডার নয়, এ সত্য তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড়ো নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপরও ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায় সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে,

সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ শ্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভেতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তে হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাইকি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি; ও-চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নয়। এইসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমাদের মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল কলেজের চাইতে একটু বেশি। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছি নে, অদ্ভুত কথাও বলছি নে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তা হলে রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই। এমনকি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমতবিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্রিতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যারা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য

অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণির মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও-বস্ত্র পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তা হলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে-বেঁধে জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত-পা ছুড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন ‘আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক’ ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃৎের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষা-শাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers; অর্থাৎ যারা পাশ করতে পারেনি বা চায় নি তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মী লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কী রকম শিক্ষা দেওয়া হতো তা আমার জানা নেই। তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কখনোই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টার মহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে ছেলেরা হয় পাশ। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলো উগলে দেয়। এর ভেতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্ত ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারি লোহার গোলাগুলোর এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলো বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্গীরণ করে দেয়। এ জন্য সমাজ তাদের বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক। কেননা আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার সে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে,



তার আপনার বলতে আর বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করেছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল। অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর—সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কেতাবি, আর এক যারা তা নয়। বাংলায় শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয়, একথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়; কেননা, সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই; অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তৃষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানিনি যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে মানুষের প্রাণ-মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্মৃতিলাভ করে না; তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা। অতএব, কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না। অর্থনীতিরও নয়, ধর্মনীতিরও নয়।

কাব্যমূর্তে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে

আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হইনি। কেননা, আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়। □ [সংক্ষেপিত]

**শব্দার্থ ও টীকা :** শৌখিন- রুচিবান। উদ্বাহ- উর্ধ্ববাহ। আহোদে হাত ওঠানো। ডেমোক্রেসি- গণতন্ত্র। সন্দিহান- সন্দেহযুক্ত। সুসার- প্রাচুর্য, সচ্ছলতা, সুবিধা। জজ- বিচারক। ভাঁড়েও ভবানী- রিক্ত, শূন্য। আবহমানকাল- চিরকাল। সোন্নাসে- আনন্দে। অবগাহন- সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে গোসল। উপায়ান্তর- অন্য কোনো উপায়। স্বশিক্ষিত- নিজে নিজে শিক্ষিত। প্রচ্ছন্ন- গোপন। জীর্ণ- হজম। অব্যাহতি- মুক্তি। গতাসু- মৃত। গলাধঃকরণ- গিলে ফেলা। কারদানি- বাহাদুরি। উদরপূর্তি- পেট ভরানো। ডেমোক্রটিক- গণতান্ত্রিক। দাতাকর্ণ- মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তীপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ। কেতাবি- কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।

**পাঠ-পরিচিতি :** 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। আমাদের পাঠচর্চার অনভ্যাস যে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটির জন্য ঘটছে তা সহজেই লক্ষণীয়। আর্থিক অনটনের কারণে অর্থকরী নয় এমন সবকিছুই এদেশে অনর্থক বলে বিবেচনা করা হয়। সেজন্য বই পড়ার প্রতি লোকের অনীহা দেখা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে ব্যাপকভাবে বই পড়া দরকার। কারণ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। যথার্থ শিক্ষিত হতে হলে মনের প্রসার দরকার। তার জন্য বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। এর জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বাধ্য না হলে লোকে বই পড়ে না। লাইব্রেরিতে লোকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সাহিত্যচর্চা করা আবশ্যিক বলে লেখক মনে করেন। 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বই পড়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি এই শিক্ষাই দেয় যে, জাতির মানসিক বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বই পড়া, জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার কোনো বিকল্প নেই।

### অনুশীলনী

#### কর্ম-অনুশীলন

১. তোমাদের স্কুলের বইপড়া প্রতিযোগিতা তোমার শিক্ষাজীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা উল্লেখ কর।
২. বই পড়ার অভ্যাস কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে তোমার প্রস্তাব দাও।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে কীসের ওপর স্থান দিয়েছেন?
 

ক. হাসপাতালের	খ. স্কুল-কলেজের
গ. অর্থ-বিল্ডের	ঘ. জ্ঞানী মানুষের
- ২। সুশিক্ষিত বলতে কী বুঝায়?
 

ক. সৃজনশীলতা অর্জন	খ. বুদ্ধির জাগরণ
গ. সার্টিফিকেট অর্জন	ঘ. উচ্চ শিক্ষা অর্জন

 উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 'পড়িলে বই আলোকিত হই  
 না পড়িলে বই অন্ধকারে রই।'
- ৩। উদ্দীপকটির ভাবার্থ 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বাক্যে বিদ্যমান?
 

ক. জ্ঞানের ভাণ্ডার ধনের ভাণ্ডার নয়।
খ. শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না।
গ. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই সুশিক্ষিত।
ঘ. আমাদের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই।
- ৪। উদ্দীপকটির ভাবার্থ 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে ভাবকে নির্দেশ করে তা হলো -
 

i. জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মৌলিকত্ব অর্জন
ii. শিক্ষাযন্ত্রের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া
iii. শিক্ষকের মাধ্যমে বিকশিত হওয়া

 নিচের কোনটি সঠিক?
 

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

জাতীয় জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতোই দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থপ্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা-ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক; অপরদিকে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে গুণু কাজের জন্য কাজ। অপরদিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে গুণু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনও উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না।

- ক. 'ভাঁড়েও ভবানী' অর্থ কী?
- খ. অন্তর্নিহিত শক্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম দিকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকটিকে ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. "উদ্দীপকে পরমার্থ বৃদ্ধির প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের মতকে সমর্থন করে" - মন্তব্যটির বিচার কর।